দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 JUL 1986

স্বদেশ-বিদেশ

বাংলাদেশের উদ্ভব কথা (৫)

বাংলা ভাষা ও বাংলা লিপি

আসকার ইবনে শাইখ

ইতিহাসের রায়, বাঙ্গালী একটি সঙ্কর জনসমষ্টি। এই সঙ্কর জনসমষ্টিরই কথা বলার মৌখিক ও লৈখিক রূপের আধুনিক নাম 'বাংলা ভাষা'। সর্ব প্রাচীন যুগে আর্যগণ যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, এবং যে ভাষায় বৈদিক গ্রন্থাদি লিখিত হইয়াছিল, কাল প্রভাবে তাহার অনেক পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের ফলেই ভারতবর্ষে প্রাচীন ও বর্তমানকালে প্রচলিত বহু ভাষার উদ্ভব হইয়াছে।..... নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণী বিভাগ হইতে এ সম্বন্ধে কতক ধারণা করা যাইবে —

১। প্রাচীন সংস্কৃত — ঋগ্বেদের সময় হইতে ৬০০ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত।

২। পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ — ৬০০ খৃঃ পূঃ হইতে ১০০০ খৃষ্টাব্দ

৩। অপভ্রংশ হইতে বাংলা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষার উৎপত্তি — ১০০০ খৃষ্টাব্দ হইতে — (অর্থাৎ বর্তমানকাল)

আর্যগণ বাংলায় আসিবার পূর্বে বাংলার অধিবাসিগণ যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহার কোন নিদর্শন বর্তমান নাই। তবে ইহার কোন কোন শব্দ বা রচনা-পদ্ধতি যে সংস্কৃতি ও বর্তমান বাংলায় আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহা খুবই সম্ভব, ইহার কিছু চিহ্নিত পণ্ডিতগণ আবিষ্কার করিয়াছেন।" (বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড [প্রাচীন যুগ], শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৪, পৃঃ ১৩৩)।

ডক্টর মজুমদারের শেষ বাক্যের সূত্র ধরে বলা যায়, "খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে রচিত 'আর্যমঞ্জুশ্রী-মূলকল্প' নামক সংস্কৃতি গ্রন্থে দেখা যায়, গৌড় ও পুণ্ড্রের লোকেরা 'অসুর-ভাষা' ভাষী (অসুরাণাং ভব্যে বাচা-গৌড়-পুণ্ড্রোদ্ভবা সদা")। তখন গৌড় বলিতে পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণ বঙ্গকে এবং 'পুণ্ড্র' বলিতে উত্তর-বঙ্গ ও উত্তর-পশ্চিম আসামকে বুঝাইত। সুতরাং, 'অসুর-ভাষা'-ভাষী লোকেরা আসামের কিয়দংশ লইয়া সমগ্র প্রাচীন বঙ্গের লোক। এখনও কোল-মুণ্ডা গোষ্ঠীর বুলির মধ্যে 'অসুর' বুলি অন্যতম। সুতরাং, এই 'অসুর-ভাষা' যে 'অষ্ট্রিক' বুলি, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বর্তমান বাংলা-ভাষা প্রচলিত হইবার পূর্বে আমাদের দেশে যে এই 'অসুর-ভাষা' বা 'অষ্ট্রিক' বুলি প্রচলিত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।" (মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, ১৯২৭, পৃঃ ৫)।

'অষ্ট্রিক'-ভাষা পরিচয় প্রসঙ্গে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়-এর অভিমতঃ "আসাম, মালয়, তালেঙ্গ, খাসিয়া, কোল (অথবা মুণ্ডা), সাঁওতাল, নিকোবর, মালাক্কা প্রভৃতি ভূমির বিভিন্ন অধিবাসীরা যে সব ভাষায় কথা বলে, তালেঙ্গ ও খমের গোষ্ঠীর প্রাচীন সাহিত্য যে সব ভাষায় রচিত সেই ভাষাগুলি একই পরিবারভুক্ত। এই বিরাট ভাষা-পরিবারের নাম 'অষ্ট্রিক'। এই সব অধিবাসীরা জন হিসেবে একই গোষ্ঠীর নয়। ঐ সব ভূখণ্ডে আদিমতম স্তরে সর্বত্রই অষ্ট্রিক ভাষার প্রচলন ছিল। নানা জন-বিবর্তনের ভেতর দিয়েও সেই ভাষাপ্রবাহ আজও চলে আসছে। এক সময় এই ভাষা মধ্যভারত থেকে আরম্ভ করে সাঁওতাল ভূমি, আসাম, নিম্নব্রহ্ম, মালয়, আনাম নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি সমস্ত ভূখণ্ডে বিস্তৃত ছিল। এই ভূখণ্ডের দক্ষিণেই দ্রাবিড়ভাষী জনপদ এবং তার ফলে জোরালো দ্রাবিড় ভাষা, কোল ভাষার ভূখণ্ডে কোথাও কোথাও ঢুকে পড়েছে। অথচ সবাই জানে, দ্রাবিড় ভাষার সঙ্গে কোল ভাষার সম্বন্ধই নেই। আবার অন্যদিকে হিমালয়ের ঠিক নিচে এমন সব বুলি এখনও প্রচলিত, যেগুলি ভোট-বর্মী গোষ্ঠীর ভাষা হলেও, তাদের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যা মুণ্ডা ভাষারই বিশেষ লক্ষণ। অষ্ট্রিক ভাষার বিস্তৃতি উত্তর ভারতের অনেক জায়গাতেই ছিল। পরের যুগে দ্রাবিড় ও আর্য ভাষা পশ্চিম দিকে এবং ভোট-বর্মী ভাষা পূর্ব দিকে অষ্ট্রিক ভাষাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে অধিকাংশ জায়গাতেই তাকে গ্রাস করে একেবারেই হজম করে ফেলেছে। যে জায়গায় পারেনি বা নানা প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক কারণে সম্ভব হয়নি, সেখানেই কোন রকমে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের তো সামান্য কিছু লোকের বুলির মধ্যে টিকে থেকেছে।" [বাঙ্গালীর ইতিহাস, সংক্ষেপিত আকারে ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়-এর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)' সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ১৯৬০, পৃঃ ৮]।

বার কোন ভাষার প্রভাবে কোন ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, সে সম্পর্কে পণ্ডিতগণের কিছু অভিমত তুলে ধরছি। ডক্টর শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, "আর্যগণের সংস্পর্শে ও প্রভাবে বাংলার প্রাচীন অধিবাসীগণ নিজেদের ভাষা ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে আর্য ভাষা গ্রহণ করেন।..... যখন আর্যগণ এদেশে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন, তখন প্রাচীন সংস্কৃত হইতে প্রথমে পালি ও প্রাকৃত, এবং পরে অপভ্রংশ, এই তিনটি ভাষার উৎপত্তি হয়।" (বাংলাদেশের ইতিহাস ..... ইত্যাদি, পৃঃ ১৩৩)।

এ প্রসঙ্গে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের অভিমতঃ "বগুড়ার মহাস্থান গড়ে প্রাপ্ত শিলালিপিই প্রাচীন বাংলায় আর্য ভাষার একমাত্র অভিজ্ঞান। ইহা প্রাচীন মাগধী বা প্রাচ্য প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত। প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্যভাষা কালক্রমে 'প্রাকৃত' নামে পরিচিত এবং আমরা বর্তমানে যে নানা শ্রেণীর ও ধরনের প্রাকৃতের সন্ধান পাই তাহাতে পরিণত হইয়াছিল। এই 'প্রাকৃত-ভাষা' মগধে যেরূপ ধারণ করে, তাহাকেই 'প্রাচ্য-প্রাকৃত' বলা হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে দণ্ডী যে ভাষাকে 'গৌড়ী-প্রাকৃত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই 'মাগধী-প্রাকৃত' বা প্রাচ্য-প্রাকৃতের রূপ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষাবিদগণ নিঃসন্দেহভাবেই প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, আধুনিক বাংলা-ভাষা 'মাগধী-প্রাকৃত' তথা 'গৌড়ী-প্রাকৃতে'ই বিবর্তিত রূপ। ইহা যে সরাসরিভাবে সংস্কৃতি হইতে উদ্ভূত নহে, বর্তমান বাংলা ভাষাই তাহার প্রধান প্রমাণ।

"যে প্রাকৃত ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব এবং উর্দু, পাঞ্জাবী, সিন্ধী প্রভৃতি পাক-ভারত উপ-মহাদেশের উত্তর ও পশ্চিম এলাকাসমূহের যাবতীয় ভাষার উৎপত্তি ও ঠিকানা, সেই প্রাকৃতের পূর্বীরূপ হইতেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ঠিকানা সাধিত হইয়াছে।" (মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃঃ ৭)।

আপাত দৃষ্টিতে ডক্টর মজুমদার ও ডক্টর হক 'কোন্ ভাষা থেকে কোন্ ভাষা' প্রশ্নে ভিন্ন মত পোষণ করেন বলে মনে হতে পারে। এ ব্যাপারে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন, "যে সময় ঋষিগণের মধ্যে বৈদিক ভাষা প্রচলিত ছিল সেই সময় সাধারণ আর্যগণের মধ্যে বৈদিক হইতে কিছু বিভিন্ন লৌকিক ভাষা প্রচলিত ছিল। বৈদিক ছিল অভিজাততন্ত্রের ভাষা, লৌকিক ছিল গণতন্ত্রের ভাষা"। ঋষিরা বলিলেন, "লৌকিক ভাষা অগ্রাহ্য অকথ্য। ন ম্লেচ্ছিতবৈ। নাপভাষিতবৈ। ম্লেচ্ছ ভাষা ব্যবহার করিও না। অপভাষা ব্যবহার করিও না। যদি কর, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।" ঋষিরা বলিলেন, "খবরদার! ব্যঞ্জনের উচ্চারণে কিংবা স্বরের উচ্চারণে যদি এক চুল পরিমাণ এদিক ওদিক হয়, আর তোমার রক্ষা নাই। ..... ঋষিদিগের শত সহস্র দাহ্যাত্তেও কিন্তু বৈদিক ভাষা পূজা অর্চনায় ছাড়া অন্যত্র লৌকিক ভাষার নিকট টিকিতে পারিল না। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাত তন্ত্রের পরাজয় হইল। পরবর্তীকালে উচ্চবর্ণেরা লৌকিক ভাষাকে সজ্জিত করিয়া সংস্কৃত করিয়া লইল। সাধারণ্যে লৌকিক ভাষা পালী ব্যবহার করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রকারেরা বলিলেন, "ন ম্লেচ্ছভাষং শিখেত। ম্লেচ্ছভাষা শিখিও না।" তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দুর্দশা, বৌদ্ধ ধর্ম্ম তাহার নবীন তেজে দন্ডায়মান। কেহ ব্রাহ্মণের কথা শুনিল না। বৌদ্ধ গণতন্ত্রের পক্ষ হইলে। পালী ভাষা এক বিপুল সাহিত্যের ভাষা হইল। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাততন্ত্রের পরাজয় হইল।

আর এক যুগ আসিল। রাজশক্তি বৌদ্ধ। বৌদ্ধ এখন অভিজাততন্ত্রের দিকে। বৌদ্ধ এখন ধর্ম্মের দোহাই পালীকে ধরিয়া রাখিতে চাহিল; তখন কিন্তু গণতন্ত্রের পক্ষ লইল জৈন ধর্ম্ম। তখন লৌকিক ভাষা প্রাকৃত। পালী প্রাকৃতের নিকট তিষ্ঠিতে পারিল না। গণতন্ত্রে নিকট অভিজ্ঞাততন্ত্রের পরাজয় হইল।

আর এক যুগ আসিল। এ যুগ অন্ধকারময়। এ যুগে উচ্চ শ্রেণীর প্রাকৃত নিম্ন শ্রেণীর অপভ্রংশের নিকট পরাজিত হইল। এই অপভ্রংশ হইল বাংলা, ওড়িয়া আসামী, হিন্দী, গুজরাতী, মারহাটী প্রভৃতি দেশীয় ভাষাসমূহের জননী।" (ভাষা ও সাহিত্য, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪৮ পৃঃ ১০-১২)।

এইসব অভিমত থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, মতের বৈসাদৃশ্য উপরোক্ত পণ্ডিতদের তেমন একটা নেই; তবে এ-ও প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন বাংলার অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় নিজেদের ভাষা ত্যাগ করে 'সম্পূর্ণভাবে' আর্য ভাষা গ্রহণ করে নাই। করার কথাও নয়। দেওয়া-নেওয়ার সমন্বয় পথে শেষ পর্যন্ত অপভ্রংশ ভাষা থেকে বাংলা ভাষার সৃষ্টি। তাই তো ডক্টর হকের সঙ্গে আমাদের একমত হতে হয় যখন তিনি বলেন, "এ প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, বাংলা ভাষায় বিদেশী (অর্থাৎ আরবী, ফারসী, পুর্তগীজ, ইংরেজী প্রভৃতি) শব্দের সংখ্যা শতকরা মোট ৮ (আট) ভাগ। অবশ্য খাস সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা শতকরা ২৫ (পঁচিশ) হইতে ৩০ (ত্রিশ)-এর বেশী নহে; বাকিগুলি প্রাকৃত বা অপভ্রংশ। কি করিয়া প্রাচীন বাংলার 'অসুর-ভাষা' এমনভাবে তলাইয়া গেল, সে ইতিহাসে স্পষ্টভাবে পাওয়া না গেলেও ভালো করিয়াই অনুমান করা যায়।.... বর্তমান বাংলা ভাষার উপর সংস্কৃতের প্রত্যক্ষ প্রভাব যেমন অত্যন্ত নগণ্য, তেমনি আধুনিকও বটে।" (মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, পৃঃ ৭)।

নানা বিবর্তনের ফলে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হল, কিন্তু তার উৎপত্তিকাল সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলে পারা যায় না। আর বলতে পারার কথাও নয়। কারণ, দিন-ক্ষণ নির্দিষ্ট করে তো আর কোন ভাষারই জন্ম হয় না। ভাষার সৃষ্টি হয় ধীরে ধীরে, দেশ-কাল পাত্রগত বিবর্তন ধারার ক্রমিক অনুসরণে। তবে, প্রত্যেক ভাষারই একটা সৃজ্যমান কাল থাকে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সেই সৃজ্যমান কাল হল খৃষ্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কাল। এই কালে সৃজ্যমান বাংলা ভাষার নমুনা হচ্ছে 'চর্যাবিনিশ্চয়' নামক 'বৌদ্ধ চর্যাপদ' বা 'বৌদ্ধ চর্যাগীতির' একটা সঙ্কলন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে তা আবিষ্কার করে এনে প্রকাশ করেন। তা-ই হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। ওই সঙ্কলনে ২৩ জন কবি বিরচিত ৪৬টি চর্যাপদ এবং একটি খণ্ডিত চর্যাপদ রয়েছে। এমনি চর্যাপদের বা চর্যাগীতির একটা নমুনা নীচে দেওয়া হল; এর থেকে একটা সাহিত্য ধারণার সঙ্গে সঙ্গে বুঝা যাবে বাংলা ভাষার কি রূপটা তার সৃজ্যমানকালে বর্তমান ছিল।

উচা উচা পাবত, তাই বসই শবরী বালী।
মোরঙ্গী পিচ্ছ পরহিণ, গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত শবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহারী।
তোহেরি নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দারী॥
নানা তরুবর মৌলিল রে, গত্তণত লাগেলি ডালী।
একেলী শবরী এ বন হিণ্ডই, কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী॥
তিঅ-ধাউ খাট পড়িলা শাবরো, মহাসুহে সেজি ছাইলা।
শবরো ভুজঙ্গ নৈরামনি দারী, পেম্ন রাতি পোহাইলী।

আধুনিক বাংলায় তার রূপান্তর হচ্ছেঃ

উচু উচু পর্বত, তায় শবরী বালিকা করে বাস,
ময়ূর পুচ্ছ পরিহিতা, তার গলায় গুঞ্জার মালা।
হে উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, করিও না গোল গোহারি,
তোমার নিজ গৃহিনীও সহজ সুন্দরী নামে পরিচিতা।
নানা তরুবর মুকলিত হল, গগনে লাগল, তাদের ডাল,
শবরী বালিকা এ বনে একাকী ভ্রমণ করে, কর্ণে কুণ্ডল ও বজ্রধারিণী।
তিন ধাতুর খাট পড়ল হে শবর, মহাসুখে তুমি শয্যা বিছাইলে, শবর ভজুঙ্গ আর নৈরাত্মা দারা, উভয়ে প্রেমে রাত্রি পোহাইলে।

এবারে বাংলা লিপির কথায় আসা যাক। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, বর্তমানের মত প্রাচীনকালেও সংস্কৃত ভাষা নাগরী অক্ষরে লেখা হত এবং বাংলা ভাষার লিপিমালা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। আসলে কিন্তু তা নয়। প্রাচীনকালে সর্বত্রই সংস্কৃত, প্রাকৃত ও দেশীয় ভাষা সবই এক রকম অক্ষরে লিখিত হত। দেশ ও কাল ভেদে সেই অক্ষরের হল ভিন্ন ভিন্ন বিবর্তিত রূপ। ডক্টর শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, "মৌর্য সম্রাট অশোক খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে যে ব্রাহ্মী লিপিতে তাঁহার অধিকাংশ শাসনমালা উৎকীর্ণ করান, তাহা হইতেই ক্রমে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন বর্ণমালার উদ্ভব হইয়াছে। সম্রাট অশোকের সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত আর সর্বত্রই এই এক প্রকার লিপিরই প্রচলন ছিল। কালক্রমেও স্থানীয় লোকের বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশে ইহার কিছু কিছু পরিবর্তন আরম্ভ হয়। এই প্রকার পরিবর্তন সত্ত্বেও গুপ্তযুগের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বর্ণমালার মধ্যে প্রভেদ খুব বেশী ছিল না। এক দেশের লোক অন্যদেশের বর্ণমালা পড়িতে পারিত।

গুপ্ত যুগেই প্রথম প্রাদেশিক বর্ণমালার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও প্রভেদ বাড়িয়া উঠে। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে পূর্ব ভারতের ও পশ্চিম ভারতের বর্ণমালা দুইটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বন করে। পশ্চিম ভারতের সিদ্ধমাতৃকা-বর্ণমালা ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইতে হইতে নগরীতে পরিণত হয়। আর পূর্ব ভারতের বর্ণমালা হইতে অবশেষে বাংলা বর্ণমালার উৎপত্তি হয়। ..... প্রথম মহীপালের বার্ণগড়-লিপিতে ব্যবহৃত অ, উ, ক, খ, গ, ধ, ন, ম, ল এবং ক্ষ অনেকটা বাংলা অক্ষরের আকার ধারণ করিয়াছে। জ একেবারে সম্পূর্ণ বাংলা 'জ'য়ের অনুরূপ। দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বিজয় সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ২২টি পুরাপুরি অথবা প্রায় বাংলা অক্ষরের মত। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে তাম্রশাসনের অক্ষর প্রায় সম্পূর্ণ আধুনিক বাংলা অক্ষরে পরিণত হইয়াছে। ইহার পর ৩/৪ শত বছর পর্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে এই অক্ষরের কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পরিবর্তন বিশেষ কিছু হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের ফলে বাংলা অক্ষরগুলি একটি নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে।..... এইরূপে দেখা যায় যে, গুপ্ত যুগের পরবর্তীকালে বাংলায় যখন একটি স্বাধীন পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপিত হয়, সেই সময় হইতেই পূর্ব ভারতে একটি বিশিষ্ট বর্ণমালার প্রচলন হয়। ক্রমে এই বর্ণমালা পরিবর্তিত হইয়া বাংলার নিজস্ব বর্ণমালায় পরিণত হয়। বলা বাহুল্য যে, চিরকালই বাংলায় প্রচলিত অক্ষরেই বাংলাদেশে সংস্কৃত, প্রাকৃতও দেশীয় ভাষা প্রভৃতি লিখিত হইত। সংস্কৃত ভাষা, লিখিবার জন্য নাগরী অক্ষরের ব্যবহার অতি আধুনিককালেই হইয়াছে।..... আর নাগরী অক্ষর বাংলা অপেক্ষা প্রাচীন নহে; অর্থাৎ দশম শতাব্দীতে বাংলাদেশে ব্যবহৃত অক্ষরের সহিত বর্তমান বাংলা অক্ষরের যে সম্বন্ধ, ঐ সময়ে পশ্চিম ভারতে ব্যবহৃত অক্ষরের সহিত বর্তমান নাগরী অক্ষরের সম্বন্ধ তদপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠ নহে। বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড [প্রাচীন যুগ], শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৪ পৃঃ ১৫১-১৫৩)।

বাংলার প্রাচীন অধিবাসীরা, এককথায় প্রাচীন বাঙ্গালীরা, সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করত। তাদের পরিবার ছিল, ঘর-গেরস্থালি ছিল। কিন্তু তাদের লিপিবদ্ধ কোন ভাষা ছিল না। মৌখিক একটা ভাষা তাদের ছিল; কিন্তু লিপিবদ্ধ হয়ে লিখিত না হলে তা ভাষার মর্যাদা পায় না। ভাষার লৈখিক রূপ না থাকলে, এক যুগের মানুষদের ধ্যান-ধারণার প্রকাশ হিসেবে কোন কিছু লিখিত না থাকলে, অন্য যুগের মানুষ তা জানবে কি করে? এক যুগ অন্য কোন অনাগত যুগের কাছে তার মন-মানসের বিচিত্র সব প্রকাশ-রূপ পৌঁছে দেয় লিপিবদ্ধ ভাষায়। আর্যপূর্ব বাংলার অধিবাসীদের তেমন কোন লিপি না থাকায় তাদের জ্ঞান-গরিমা, চিন্তা-ভাবনা, শিক্ষাদীক্ষা এবং শিল্প-সাহিত্য, সঙ্গীতের কোন কিছুরই বিবরণ আজ আর পাওয়া যায় না, পাওয়ার কথাও নয়। যতটুকু পাওয়া যায়, তা পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে পুরুষানুক্রমে মুখেমুখে উচ্চারিত কিছু শব্দ-সম্ভারমাত্র। তাদের সংস্কার-সংস্কৃতির খবরও আমরা পাই ঠিক এইভাবে; পুরুষানুক্রমে পোষিত ও পালিত আচার-আচরণের মধ্য দিয়েই তা বর্তমানকালে যতটুকু পৌঁছুবার, পৌঁছেছে। এককথায়, সেই প্রাচীনতম শব্দসম্ভার ও সংস্কৃতির যতটুকু আজও টিকে আছে, ততটুকুই আজ জানা যায়। তার বেশি জানবার কোন উপায়ই আজ আর নেই।

ভাষা সম্পর্কে আর একটি কথা। পূর্ব-ভারতের অন্যান্য স্থানের মত বাংলারও সবচেয়ে পুরনো ভাষা ছিল অষ্ট্রিক-গোষ্ঠীর ভাষা। মণ-খমের ভাষা-পরিবারের সঙ্গে তার নিকট সম্পর্ক। কোল-মুণ্ডাদের ভাষার সঙ্গেও কিছুটা আত্মীয়তা আছে তার। এই মন-খমের ভাষার উপর কিছুটা মিশ্রণ এনেছিল দ্রবিড় ভাষা; কিন্তু সেটা পশ্চিম ও মধ্য বাংলায়-যতটা, পূর্ব ও উত্তর বাংলায় ততটা নয়। বরং পূর্ব ও উত্তর বাংলায় মুণ্ডা-মনখমের ভাষার উপর ভোট-ব্রহ্ম ভাষার ঢেউ এসে লেগেছিল, এবং ভোট-ব্রহ্ম ভাষা হচ্ছে প্রাচীন কিরাতদের ভাষা।